POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ○

হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে তুমি দান কর, এবং কিয়ামতের দিনে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না। তুমি আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।'

(আলে ইমরান:১৯৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 19

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 7 মে, 2020 13 রমযান 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

মামলার বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা বিচারকের পরম কর্তব্য, যাতে কারো অধিকার হরণ না হয়। মুত্তাকি খোদার দিকে উত্থিত হয় আর জগত নিজেই তার পিছনে থাকে। কিন্তু জগতপূজারী জগতের কারণে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। তথাপি সে সুখ থেকে বঞ্চিত থাকে। দেখ, সাহাবাগণ জগত ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু জাগতিকভাবেও তাঁরা সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং পরকালের ফলও ভোগ করেছিলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আদালত এবং সেখানে কিভাবে সাক্ষীরা উকিল ও বিচারকদের ভয়ে গুটিয়ে থাকে সে বিষয়ে একবার আলোচনা হচ্ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বললেন: আদালতে সাক্ষীরা প্রায় উকিল এবং বিচারকদের সামনে ভয়ে এমন কাবু হয়ে পড়ে যে মানবাধিকার রক্ষার জন্য তারা কিছুই করে উঠতে পারে না, আর অসত্য ও ভুল বয়ান দিয়ে ফেলে, যা অন্যায়ের জন্ম দেয়। আদালতের ভয়ও এক প্রকার শিরক। ইন্নাশশিরকা লাযুলমুন আযীম।

তিনি বলেন: কিছু কিছু ইংরেজ বিচারক মামলার বিচার করতে অনেক তদন্ত করেন এবং চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্ত করেন। দৈবক্রমে আমি মির্যা সাহেব (পিতা)-এর সময় আমাদের কিছু খাজনাদার সঙ্গে একটি মোকদ্দমার জন্য অমৃতসরের কমিশনরের কাছে গিয়েছিলাম। রায় ঘোষণার একদিন পূর্বে কমিশনর খাজনাদারদের অন্যায় উপেক্ষা করে তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে বলেন, এরা দরিদ্র মানুষ, তোমরা এদের উপর অত্যাচার করছ। সেই রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, সেই ইংরেজ এক ছোট্ট শিশুরূপে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর আমি তার মাথায় আলতো হাতে চাপড়ে দিচ্ছি। সকালে আমরা আদালতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম তার অবস্থা এমন বদলে গেছে যেন সে সেই পূর্বের ব্যক্তি ছিল না। সে খাজনাদারদের তীব্র ভর্ৎসনা করল এবং মামলায় আমাদের পক্ষে রায় দিল এবং আমাদের সমস্ত খরচও তাদের কাছ থেকে আদায় করল।

তিনি বলেন: মামলার বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা বিচারকের পরম কর্তব্য, যাতে কারো অধিকার হরণ না হয়।

তিনি বলেন: দেখ, মানুষ যদি স্থির চিত্ত ও শান্ত স্বভাবের না হয়, যেখানে জাগতিক বিচারকের সামনে দাঁড়ানো কঠিন হয়, তবে সে সময় কি অবস্থা হবে যখন 'আহকামুল হাকেমিন' (সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক)-এর সামনে দাঁড় করানো হবে?

তিনি বলেন: তওরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যক্তিকে ক্রুশে দেওয়া হয় সে অভিশপ্ত। আশ্চর্যের বিষয় হল খৃষ্টানরা নিজেদের নাজাতের জন্য কাফফারা' মতবাদ উদ্ভাবন করতে স্বীকার করেছে যে যীশূ ক্রুশে চড়ে অভিশপ্ত হয়েছে। তারা যখন যীশূর জন্য একটি অভিশাপকে মেনে নিল, সেক্ষেত্রে কাফফারা মতবাদকে পোক্ত করতে অন্য অভিশাপও কেনই বা মেনে নিত না। অভিশাপ' শব্দটিই যখন যুক্ত হল, সেখানে একটির স্থানে দুটি এলেও বিষয় একই দাঁড়ায়। কিন্তু কুরআন করীম এই উভয় অভিশাপকে খণ্ডন করেছে। এই দুটির জন্যই উত্তর দিয়েছে তাঁর জন্মও পবিত্র ছিল, আর মৃত্যু ছিল সাধারণ মানুষের ন্যায়, ক্রুশে তাঁর মৃত্যু হয় নি।

তিনি বলেন: মুত্তাকি খোদার দিকে উত্থিত হয় আর জগত নিজেই তার পিছনে থাকে। কিন্তু জগতপূজারী জগতের কারণে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। তথাপি সে সুখ থেকে বঞ্চিত থাকে। দেখ, সাহাবাগণ জগত ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু জাগতিকভাবেও তাঁরা সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং পরকালের ফলও ভোগ করেছিলেন।

সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীকে চেনার উপায়

প্রশ্ন করা হয় যে কিছু বিরুদ্ধবাদীও ইলহামপ্রাপ্ত হওয়ার দাবি করে। সেক্ষেত্রে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীকে চেনার উপায় কি?

তিনি বলেন: খুবই সহজ। তারা আমার বিপক্ষে এই দাবি প্রকাশ করুক যে, 'যদি আমরা সত্যবাদী হই তবে আমাদের বিরুদ্ধবাদী আমাদের পূর্বে মারা যাবে।' খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে এই দৃঢ় বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে একজন দশ বছরের বালক, যার মধ্যে জীবনের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত, যার দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে, সে যদি এই দাবী করে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আমার পূর্বে মৃত্যু দিবেন।

শিয়াদের ধর্মমত

শিয়া ধর্ম ইসলামের ঘোর বিরোধী। প্রথমত, শিয়াদের মতবাদ হল জিবরাইল ওহী আনয়নের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত সাহাবাগণ রসুল করীম (সা.)-এর দোয়ার পর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এদের মতে তাঁরা মুসলমান ছিলেন না। (মাআয আল্লাহ্) তৃতীয়ত, কুরআন করীম যেটি আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র কিতাব, যাকে রক্ষা করা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শিয়াদের মতে সেটিই নাকি আসল নয়। ইমাম মাহদী আসল কুরআন গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। চতুর্থত, বারোজন ইমামের পর ওলী আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, এখন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ পশুদের মত থাকুক, খোদা তা'লা তাদেরকে আর ভালবাসেন না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

পাঞ্জাবের জন্য এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৫৫ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে। স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

ঈদ ফান্ড

এই চাঁদা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। এই তহবিলের উদ্দেশ্যে ছিল এই যে, যেখানে আনন্দ-উৎসবের সময় মানুষ ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য বস্ত্র, আহার, নেমনতন্ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের খরচ করে, অপরকে উপহারও দেয় সেখানে এই আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যও স্মরণ রাখা উচিত। আহমদী সদস্যরা বয়াতের সময়ই এই অঙ্গীকার করেছে যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। এই কারণে প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা উৎসব-আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যকে অবশ্যই স্মরণে রাখবে। এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই খাতে উপার্জনশীল আহমদী সদস্যরা একটাকা মাথাপিছু ঈদ ফান্ড হিসেবে চাঁদা দিত। প্রস্তাব হল এই যে, ঈদের দিন যে যৎসামান্য খরচ করা হয় তার অর্ধেক এই খাতে চাঁদা দেওয়া উচিত। ঈদ ফান্ডের চাঁদা ঈদের পূর্বে যে কোন দিন দেওয়া যেতে পারে। এটি কেন্দ্রীয় চাঁদা। এর পুরোটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক। এর থেকে স্থানীয়ভাবে কোন অর্থ খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আ.) বলেন-

" আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না, এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি-আমরা এর হিকমত বুঝি না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

(নুরুল হক' খণ্ড-১, পৃ: ৫)

নিকাহ্‌র জন্য ওলীর অনুমতি অনিবার্য

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) খুতবা জুমআ প্রদত্ত ৮ই এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বলেন-

" বিবাহ সম্পর্কে এই বিষয়টি মেয়েদের জন্যও স্পষ্ট হওয়া জরুরী যে, যদিও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দকেও স্থান দেওয়া উচিত এবং মহানবী (সা.) মেয়ের পছন্দকে মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু ইসলাম এ বিষয়টিকেও মেনে চলতে বাধ্য করে যে, ওলীর অনুমতি ব্যতীত নিকাহ্ বৈধ নয়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন- " আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর পক্ষ থেকেই। আমাদের শরীয়ত বলে (অর্থাৎ ইসলামের শরীয়ত একথাই বলে) যে, কিছু ক্ষেত্রে শরিয়ত নির্ধারিত ব্যতিক্রম ছাড়া ওলীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিকাহ বৈধ নয়। যদি এমন কোন নিকাহ হয়ে থাকে তা অবৈধ ও অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে। এমন মানুষদেরকে বোঝানো আমদের কর্তব্য। যদি তারা না বোঝে তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগেও অনেক সময় এধরণের ঘটনা ঘটেছে। এক যুবতী এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ করার বাসনা করে, কিন্তু তার পিতা অস্বীকৃতি জানায়। তারা দুজনে (কাদিয়ান নিকটস্থ স্থান) নঙ্গল এসে কোন মোল্লার কাছে নিকাহ পড়িয়ে নেয় এবং তাদের বিয়ে হয়ে গেছে বলে প্রচার করে বেড়ায়। এরপর তারা কাদিয়ান আসে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ সংবাদ প্রাপ্ত হলে তাদের উভয়কে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন কেবল মেয়ের সম্মতি নিয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া নিকাহ পড়ানো শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম। সেখানেও মেয়ে সম্মত ছিল এবং বলছিল যে, এই যুবকের সঙ্গে বিয়ে করব, কিন্তু তারা যেহেতু ওলীর অনুমতি ছাড়া নিকাহ পড়িয়েছিল এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাদেরকে কাদিয়ান থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে (কাদিয়ানে সেই যুগে হযরত মুসলেহ মওউদ-এর যুগেও এমন একটি নিকাহ পড়ানো হয়েছিল। তিনি বলেন) এই নিকাহটিও অবৈধ। তার মা-কেও আমি একথাই বলেছি। (ছেলের মাকে বলেছিল। একজন মহিলা এসে বলছিল যে, যেহেতু মেয়ে রাজি ছিল তাই আমার ছেলে নিকাহ করেছে। এতে কিসের এত বিপত্তি?) তিনি (রা.) বলেন, আমি তাকে বলেছি যে, তুমি তোমার ছেলের জন্য পাত্রী পেয়েছ তাই বলছ যে, মেয়ে যেহেতু রাজি আছে তবে ওলীর সম্মতির প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমারও তো মেয়ে আছে। যদি তাদের বিয়ে হয়ে থাকে তবে তাদেরও হয়তো মেয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকে কোন মেয়ে এরকমভাবে কোন পর পুরুষের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে যাক- এটি কি তুমি পছন্দ করবে?"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৫-১৭৬ থেকে সংকলিত)

অতএব যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, পিতা-মাতাকেও কোন বৈধ কারণ ছাড়া মিথ্যা আত্মাভিমানের নামে সম্পর্ক না করার হঠকারিতা দেখানো উচিত নয় যার ফলে হত্যার মত নৃশংস অপরাধ না করে বসে। মেয়েদেরকেও ইসলাম ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আদালতে বা কোন মৌলবীর কাছে বিয়ে করার বা নিকাহ পড়ানোর অনুমতি দেয় না। যদি কোন বাধ্যবাধকতার পরিস্থিতি দেখা যায় তবে মেয়ে খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে পত্র লিখতে পারে, যিনি পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। অতএব ছেলে ও মেয়ে উভয়ই যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার নীতিকে সামনে রাখে তবে খোদা তা'লাও কৃপা করবেন।"

****

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

জরুরী ঘোষণা

যে সমস্ত সদস্য হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)কে পত্র লেখেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

তাদের সমস্ত চিঠি যথারীতি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। তথাপি কোরোনা ভাইরাস উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে চিঠির উত্তরদাতাদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উত্তর পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। হুযুর আনোয়ার (আই.) আপনাদের পত্র পাঠ করার পর আপনাদের জন্য দোয়া করছেন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। এই অতিমারি এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকে সকলকে রক্ষা করুন। সকলকে নিজ নিরাপত্তা ও শান্তির বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকলের প্রতি তাঁর কৃপা দৃষ্টি থাকুক।

(মুনীর আহমদ জাভেদ, প্রাইভেট সেক্রেটারী)

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর বিশেষ বার্তা

ওহদের যুদ্ধের সময় শত শত তীরন্দাজ নিজেদের ধনুকের অভিমুখ রসুল করীম (সা.)-এর চেহারা লক্ষ্য করে স্থির করে রেখেছিল তীর বর্ষণ করে তাঁর চেহারাকে ভেদ করে ফেলতে। সেই সময় যে ব্যক্তি রসুল করীম (সা.)–এর চেহারা রক্ষার জন্য নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তালহা (রা.)

উষ্ট্রবাহিনীর যুদ্ধেয় হযরত তালহা মৃত্যু শয্যা হযরত আলীর সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে এক ব্যক্তির হাতে হযরত আলী (রা.) বয়আত করেছিলেন।

উষ্ট্রবাহিনীর যুদ্ধের কারণসমূহ, ঘটনাবলী এবং এ সম্পর্কে উত্থাপিত কতিপয় প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর।

উষ্ট্রবাহিনীর যুদ্ধে সাহাবাদের কোনও ভূমিকা ছিল না, এটি ছিল হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম।

কোরোনা ভাইরাসের কারণের উদ্ভুত সংকটকালীন পরিস্থিতিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতির আলোকে ঘরবাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতাবিধি মেনে চলার উপদেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড (হউকে) থেকে ৩ রা এপ্রিল , ২০২০, তারিখে প্রদত্ত বিশেষ বার্তা(৩ শাহাদত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমান পরিস্থিতি ও এ দেশের সরকার প্রণিত আইন অনুযায়ী রীতিমত মুক্তাদী বা শ্রোতাদের সামনে বসিয়ে খুতবা প্রদান করা সম্ভব নয়। আইনের যতটুকু অনুমতি রয়েছে সে অনুযায়ী আজ এখানে মসজিদ থেকেই আমার খুতবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা, এখন আমার সামনে মসজিদে কেউ থাকুন বা নাই থাকুন পৃথিবীতে এই মুহূর্তে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন যারা এখন আমার খুতবা শুনছেন। এই একতা আমাদের সর্বদা বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত এবং পাশাপাশি দোয়াতেও রত থাকতে হবে। আমরা এ দোয়াই করি যে, আল্লাহ তা'লা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করুন আর এই মহামারি দূর করুন এবং মসজিদের প্রাণচাঞ্চল্য ও সৌন্দর্য আবার ফিরে আসুক।

এখন আমি খুতবার মূল বিষয়বস্তু আরম্ভ করছি। গত দুই জুমুআ পূর্বে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। তিনি জামালের যুদ্ধে বা উষ্ট্রীর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আমি তখন বলেছিলাম যে, এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে বলব। তাই, আজ আমি সে বিষয়ে বলব এবং এই আলোচনায় উষ্ট্রীর যুদ্ধ সম্পর্কে উত্থাপিত কতিপয় প্রশ্নেরও কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে।

হযরত উমর (রা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে খিলাফত সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এ বিষয়ে সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমরের মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন লোকজন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! ওসীয়্যত করুন বা কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে দিন। এতে তিনি (রা.) বলেন, আমি কতিপয় সেসব ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে খিলাফতের জন্য যোগ্য দেখি না যাদের প্রতি মহানবী (সা.) মৃত্যুকালে সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত যুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত সা'দ ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফের নাম উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর তোমাদের সাথে থাকবে, কিন্তু সে এই খিলাফতের পদাধিকারী হতে পারবে না। বলতে গেলে, তিনি যেন এটা আব্দুল্লাহ্‌কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছেন। যদি সা'দ এই খিলাফত লাভ করে, তবে সে খলীফা হবে; অন্যথায় তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই আমীর নির্বাচিত হবে সে যেন সা'দের সাহায্য-সহযোগিতা নেয়। কেননা আমি তাকে কোন কাজে অযোগ্য ছিল বলে বা কোন অবিশ্বস্ততামূলক আচরণের জন্য অপসারণ করি নি। তিনি আরও বলেন, আমার পরে যিনি খলীফা হবেন, আমি তাকে প্রাথমিক মুহাজিরদের ব্যাপারে ওসীয়্যত করছি যে, তিনি যেন তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেন এবং তাদের সম্মান রক্ষা করেন। আর আমি আনসারদের সাথেও উত্তম আচরণ করার ওসিয়্যত করছি, কেননা তারা মুহাজিরদের পূর্বে নিজেদের ঘরে ঈমানকে আশ্রয় দিয়েছে; তাদের মধ্য থেকে কাজের যোগ্য লোকদেরকে যেন গ্রহণ করা হয়। আর আমি তাকে সকল নগরবাসীর সাথে ভালো ব্যবহারের ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা ইসলামের মদদদাতা ও সম্পদের যোগানদাতা এবং শত্রুদের চক্ষুশূল। আর তাদের সম্মতিক্রমে তাদের কাছ থেকে কেবল তা-ই নেওয়া উচিত যা উদ্বৃত্ত থাকে। আর আমি তাকে আরবের বেদুঈনদের সাথেও সদ্ব্যবহার করার ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা আরবজাতির গোড়া এবং ইসলামের উৎসস্থল; তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ (দান হিসেবে) নিয়ে তা তাদের অভাবীদের মাঝে যেন বন্টন করে দেওয়া হয়। আমি তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের হাতে ন্যস্ত করছি। যাদের সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে সে অঙ্গীকার যেন পূর্ণ করা হয় এবং তাদের নিরাপত্তার যেন ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নেওয়া উচিত।

তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমরা তাকে নিয়ে পায়ে হেঁটে বের হই। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর হযরত আয়েশা (রা.)-কে আস্‌সালামু আলাইকুম বলার পর বলেন, উমর বিন খাত্তাব অনুমতি চাইছেন। তিনি বলেন, তাকে ভেতরে নিয়ে আস। সুতরাং তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তার প্রিয় দুই সাথীর সাথে রেখে দেয়া হয় বা দাফন করা হয়। তার দাফনের কাজ সম্পন্ন হলে হযরত উমর (রা.) যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন তারা সবাই সমবেত হন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, তোমাদের বিষয়টিকে নিজেদের মধ্য থেকে তিনজনের ওপর অর্পণ কর। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি আমার অধিকার হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফকে অর্পণ করছি। হযরত আব্দুর রহমান হযরত আলী এবং হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে যে-ই এ বিষয় থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবে আমরা তারই হাতে এ বিষয়টি ন্যস্ত করব। আল্লাহ্ ও ইসলাম যেন তার তত্ত্বাবধায়ক হয়। তাদের মধ্য থেকে তিনি

এমন একজনকে নির্বাচিত করবেন যিনি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ। এ ব্যাপারটি দুই বুযুর্গকেই চুপ করিয়ে দেয় অর্থাৎ তারা কোন উত্তর দেননি। এরপর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, আপনারা কি এ বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দেবেন? আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আপনাদের মধ্যে যিনি উত্তম তাকে নির্বাচিত করার বিষয়ে কোন ত্রুটি করব না । তারা দু'জন বলেন, ঠিক আছে। অতঃপর আব্দুর রহমান (রা.) দু'জনের মধ্যে একজনের হাত ধরে পৃথক স্থানে নিয়ে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এবং ইসলামেও আপনার সে মর্যাদা রয়েছে যা আপনিও জানেন। আল্লাহ্ আপনার তত্ত্বাবধায়ক। আপনি বলুন, আমি যদি আপনাকে আমীর নিযুক্ত করি তবে কি আপনি ন্যায়বিচার করবেন? আর আমি যদি উসমান (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করি তবে আপনি কি তার কথা শুনবেন এবং তার আদেশ মান্য করবেন? এরপর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) অপরজনকে নির্জনে নিয়ে গেলেন এবং তার সাথে একইভাবে কথা বলেন। উভয়ের দৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়ার পর তিনি (রা.) বলেন, হে উসমান (রা.)! আপনি আপনার হাত এগিয়ে দিন। এভাবে তিনি (রা.) তার হাতে বয়আত করেন এবং হযরত আলীও তার হাতে বয়আত করেন। এরপর ঘরের লোকেরাও ভেতরে আসে আর তারাও তার হাতে বয়আত করে। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী,কিতাবু ফাযায়েলু আসহাবিন্নাবী, হাদীস-৩৭০০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত উসমানের খিলাফতের নির্বাচন সংক্রান্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেন যে, হযরত উমর যখন আহত হন আর অনুভব করেন যে, তার অন্তিম সময় সন্নিকটে, তখন তিনি ছয়জন ব্যক্তি সম্পর্কে ওসীয়্যত করেন যে, তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা নির্বাচিত করে নেন। সে ছয় ব্যক্তি ছিলেন– হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস, হযরত যুবায়ের এবং হযরত তালহা। এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরকেও তিনি (রা.) এ পরামর্শে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্ধারণ করেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন উমরকে খলীফা হওয়ার অধিকার দেন নি। তিনি ওসীয়্যত করেন যে, তারা সবাই যেন তিন দিনের ভেতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর তিন দিনের জন্য সুহায়েবকে ইমামুস সালাত নিযুক্ত করেন। পরামর্শের তদারকির দায়িত্ব মিক্বদাদ বিন আসওয়াদের হাতে সোপর্দ করেন। আর তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন সবাইকে একস্থানে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেন এবং নিজে তরবারি নিয়ে দরজায় পাহারা দেন। তিনি আরো বলেন, যার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত থাকবে, সবাই তার বয়আত করবে। যদি কেউ বয়আত করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করবে। কিন্তু যদি উভয়দিকে তিনজন করে হয় তাহলে আব্দুল্লাহ বিন উমর তাদের মধ্য থেকে যাকে মনোনীত করবেন তিনিই খলীফা হবেন। যদি এ সিদ্ধান্তে তারা সম্মত না হয় তাহলে আব্দুর রহমান বিন অওফ যার পক্ষে থাকবেন তিনিই খলীফা হবেন। অবশেষে তালহা (রা.) সেসময় মদিনায় উপস্থিত না থাকায় পাঁচজন সাহাবী পরস্পর পরামর্শ করেন, কিন্তু কোন ফলাফল বের হয় নি। দীর্ঘ আলোচনার পর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, ঠিক আছে, যিনি নিজের নাম প্রত্যাহার করতে চান তিনি বলতে পারেন। সবাই যখন নীরব থাকেন তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম আমি আমার নাম প্রত্যাহার করছি। এরপর একইভাবে হযরত উসমান (রা.) এবং অন্য দু'জনও (তা-ই করেন)। হযরত আলী (রা.) নীরব ছিলেন, অবশেষে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) থেকে অঙ্গীকার নেন যে, তিনি সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেবেন না। এ অঙ্গীকার করার পর সব কাজ হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) তিনদিন মদিনার ঘরে ঘরে গিয়ে খিলাফতের বিষয়ে নারী-পুরুষ সবাইকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা খলীফা হিসেবে কাকে দেখতে চায়। এতে সবাই এই অভিমতই প্রকাশ করে যে, তারা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের বিষয়ে একমত। সুতরাং তারা সবাই হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রদান করে আর তিনি খলীফা নিযুক্ত হন।

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪৮৮-৪৮৯)

এটি ইতিহাসের আলোকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বর্ণনা।

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা তফসীর ফাতহুল বারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর ওসীয়্যত করার সময় সম্ভবত হযরত তালহা (রা.) উপস্থিত ছিলেন না। তিনি হয়ত হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর উপস্থিত হয়েছিলেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, পরামর্শসভা শেষ হয়ে যাবার পর তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। অপর এক বর্ণনানুযায়ী, যা অধিক সঠিক, হযরত উসমান (রা.)-এর বয়আতের আনুষ্ঠানিকতার পর তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন।

(ফাতহুল বারি শারাহ বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৯)

যাহোক, হযরত উসমান (রা.) খলীফা নিযুক্ত হন, এরপর এই ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিকভাবে কাজ করা আরম্ভ করে। হযরত উসমান (রা.) যখন শহীদ হন তখন সবাই হযরত আলী (রা.)-এর কাছে ছুটে যায়, এদের মাঝে সাহাবীগণ ও তাবেঈনরা ছিলেন, তারা সবাই বলছিলেন যে, হযরত আলী (রা.) হলেন আমীরুল মু'মিনীন। তারা তাঁর ঘরে এসে বলেন যে, আমরা আপনার বয়আত করছি। সুতরাং আপনি আপনার হাত দিন; কেননা আপনিই এর সবচেয়ে বেশি যোগ্য। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) বলেন, এটি তোমাদের কাজ নয়; এটি বদরী সাহাবীদের কাজ। তাঁরা যাকে পছন্দ করবেন তিনিই খলীফা হবেন। তাই সকল বদরী সাহাবী হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন যে, আমরা এই পদের জন্য আপনার চেয়ে অধিক যোগ্য কাউকে দেখছি না। অতএব, আপনি আপনার হাত দিন; যেন আমরা আপনার হাতে বয়আত করতে পারি। তিনি (রা.) বলেন, হযরত তালহা এবং যুবায়ের (রা.) কোথায়? হযরত তালহা (রা.) সর্বপ্রথম মৌখিকভাবে তার বয়আত করেন, আর হাতে হাত রেখে হযরত সা'দ (রা.) সর্বপ্রথম তার বয়আত করেন। এটি দেখার পর হযরত আলী (রা.) মসজিদে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়ান। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি উঠে এসে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে বয়আত করেন তিনি ছিলেন হযরত তালহা (রা.)। এরপর হযরত যুবায়ের (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরা হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০৭)

হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত করেছেন কিনা– এ বিষয়টি খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের কতিপয় আপত্তির খণ্ডনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক বক্তৃতায় বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করার প্রয়োজন রয়েছে তাই আমি ব্যাখ্যা করছি। তিনি (রা.) খাজা সাহেবকে বলেন, হযরত তালহা, যুবায়ের এবং আয়েশা (রা.)-এর বয়আত না করার বিষয়টিকে আপনি প্রমাণ হিসেবে নেবেন না। কারণ, তারা মোটেও খিলাফতের অস্বীকারকারী ছিলেন না, বরং হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের প্রশ্নটি ছিল মূল বিষয়। অধিকন্তু আমি আপনাকে বলছি, যে ব্যক্তি আপনাকে বলেছে যে, তাঁরা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত করেন নি, সে ভুল বলেছে। হযরত আয়েশা (রা.) নিজের ভ্রান্তি স্বীকার করে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন। আর হযরত তালহা এবং যুবায়ের (রা.) বয়আত না করা পর্যন্ত ইন্তেকাল করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা হলো। এগুলো খাসায়েসে কুবরার ২য় খণ্ডের উদ্ধৃতি। আরবী অংশ ছেড়ে দিয়ে শুধু অনুবাদ পড়ছি।

"হাকেম বর্ণনা করেন, সওর বিন মুজযা আমাকে বলেছেন যে, আমি উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন হযরত তালহার পাশ দিয়ে যাই। তখন তিনি অন্তিম শ্বাস নিচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন দলের সদস্য। আমি উত্তরে বললাম, হযরত আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা.)-এর জামা'তের সদস্য। এতে তিনি বলেন, ঠিক আছে তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দাও যেন আমি তোমার হাতে বয়আত করতে পারি। অতঃপর তিনি আমার হাতে বয়আত করেন আর এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। আমি ফিরে এসে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পুরো ঘটনা বিবৃত করি। তিনি (রা.) সব শুনে বলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ্‌র রসূলের কথা কী চমৎকারভাবে সত্য প্রমাণিত হলো! আল্লাহ্ তা'লাও চেয়েছেন যে, তালহা যেন আমার হাতে বয়আত না করে জান্নাতে প্রবেশ না করেন।

তিনি আশারায়ে মুবাশ্বারা (জান্নাতের সুসংবাদ লাভকারী দশজন)-এর অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্মুখে একবার যখন উষ্ট্রীর যুদ্ধের উল্লেখ করা হয় তখন তিনি (রা.) বলেন, এরা কী উষ্ট্রীর যুদ্ধের কথা বলছে? কোন একজন বলল, জ্বী হ্যাঁ, সেটিরই আলোচনা হচ্ছে। তখন তিনি বলেন, হায়! সেদিন যারা নীরবে বসে ছিলেন আমিও যদি তাদের মতো বসে থাকতাম। আর আমার এই বাসনা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে দশটি সন্তান জন্ম দেওয়ার চেয়েও অধিক প্রবল যাদের প্রত্যেকে আব্দুর রহমান বিন হারেস বিন হিশামের মতো হবে। এছাড়া, তালহা ও যুবায়ের আশারায়ে মুবাশ্বারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তাদেরকে মহানবী (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে রেখেছেন আর মহানবী (সা.)-এর সুসংবাদের সত্য সাব্যস্ত হওয়া সুনিশ্চিত। শুধু তাই নয়, তারা বয়আতের বাইরে থাকা হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন ও তওবাও করে নিয়েছিলেন।

এর উদ্ধৃতিও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেছেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত বরণ ও আলী (রা.)-এর বয়আত গ্রহণ এবং উষ্ট্রীর যু দ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

"হত্যাকারীদের দল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নিজেদেরকে অভিযোগমুক্ত রাখার জন্য অন্যদের ওপর অভিযোগ আরোপ করত। তারা যখন জানতে পারে যে, হযরত আলী (রা.) মুসলমানদের বয়আত নিয়েছেন তখন তাঁর ওপর অভিযোগ আরোপ করার একটি মোক্ষম সুযোগ তারা পেয়ে যায়। একথা সত্য ছিল, অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের কয়েকজন যোগ দিয়েছিল। তাই, এসব মুনাফেক অভিযোগ আরোপের একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়েছিল। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে দল মক্কার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল সেই দল হযরত আয়েশা (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে জিহাদের ঘোষণা দিতে সম্মত করে। ফলে, তিনি (রা.) জিহাদের ঘোষণা দেন এবং সাহাবীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান। হযরত আলী (রা.) যথাশীঘ্র হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ নিবেন– এই শর্তে হযরত তালহা ও যুবায়ের তাঁর হাতে বয়আত করেন। তারা অর্থাৎ এরা দু'জন 'যথাশীঘ্র'-এর যে অর্থ বুঝেছেন তা হযরত আলী (রা.)-এর দৃষ্টিতে সময়োপযোগী ছিল না। তিনি মনে করতেন, প্রথমে সকল প্রদেশের শৃঙ খলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক এরপর হত্যাকারীদের শাস্তির প্রতি মনোনিবেশ করা যাবে। কেননা, ইসলামের সুরক্ষা হলো অগ্রগণ্য; হত্যাকারীদের বিচার বিলম্বে হলেও কোন ক্ষতি নেই। তেমনিভাবে হত্যাকারীদের সনাক্তকরণেও মতবিরোধ ছিল। যারা মুখ বানিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আলীর কাছে পৌঁছে যায় এবং ইসলামে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে তাদের ব্যাপারে স্বভাবতই হযরত আলী (রা.)-এর সন্দেহ হয় নি যে, এরাই নৈরাজ্যের মূল হোতা। অন্যরা তাদেরকে সন্দেহ করত। এই মতবিরোধের কারণে তালহা ও যুবায়ের (রা.) মনে করেন যে, হযরত আলী (রা.) নিজের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। কেননা, তারা একটি শর্তে বয়আত করেছিলেন আর তাদের দৃষ্টিতে হযরত আলী (রা.) সে শর্ত পূরণ করেন নি। তাই তারা নিজেদেরকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বয়আতের বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করতেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর জিহাদের ঘোষণা সম্পর্কে যখন তারা অবগত হন, তখন তারাও তাঁর সাথে অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে গিয়ে যুক্ত হন এবং সবাই মিলে বসরার দিকে চলে যান। বসরার গর্ভণর মানুষকে তাঁর দলে যোগ দেয়া থেকে বিরত রাখে। কিন্তু মানুষ যখন জানতে পারে যে, তালহা (রা.) এবং যুবায়ের (রা.) কেবল এক দৃষ্টিকোণ থেকে ও একটি শর্ত সাপেক্ষে হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছেন তখন অধিকাংশ মানুষ তাঁর সাথে যোগদান করে। হযরত আলী (রা.) এই বাহিনী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তিনিও একটি বাহিনী প্রস্তুত করে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন। বসরায় পৌঁছে তিনি (রা.) এক ব্যক্তিকে হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা.)-র কাছে প্রেরণ করেন। সেই ব্যক্তি প্রথমে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আপনার অভিপ্রায় কী? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, সংশোধনই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এরপর সেই ব্যক্তি হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.)-কেও ডেকে পাঠায় আর তাদেরকেও জিজ্ঞেস করে যে, আপনারাও কি একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে উদ্যত? তারাও বলেন, হ্যাঁ। তখন সেই ব্যক্তি বলে, আপনাদের উদ্দেশ্য যদি সংশোধনই হয়ে থাকে তাহলে আপনারা যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা সংশোধনের পন্থা নয় বরং এর পরিণতি হবে নৈরাজ্য। বর্তমানে দেশের অবস্থা এমন যে, আপনি যদি একজনকে হত্যা করেন তাহলে হাজার লোক তার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এর বিরোধিতা করবে, আর আরো বেশি মানুষ তাদেরকে সমর্থন দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। কাজেই (এ পরিস্থিতিতে) সংশোধনের সঠিক উপায় হলো সর্বাগ্রে দেশ ও জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং এরপর দুষ্টচক্রকে শাস্তি দেওয়া। অন্যথায় এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া দেশে আরো বেশি নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেওয়ার নামান্তর। সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর সরকারই শাস্তি দিবে। একথা শুনে তারা বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর উদ্দেশ্য যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে তিনি আসুন, আমরা তাঁর সাথে বসতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর সেই ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে অবগত করেন এবং উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুদ্ধ করা ঠিক হবে না বরং শান্তিচুক্তি হওয়া উচিত।

সাবাপন্থী অর্থাৎ যারা আব্দুল্লাহ্ বিন সাবার দলভুক্ত এবং হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী ছিল তারা এ সংবাদ জানার পর ভীষণ ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সংগোপনে তাদের একটি দল পরামর্শ করার জন্য একত্রিত হয়। পরামর্শ করার পর তারা এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুসলমানদের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হওয়া আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হবে, কেননা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যার শাস্তি ততক্ষণ এড়াতে পারি যতক্ষণ মুসলমানরা পরস্পরের মাঝে বিবদমান থাকবে। যদি সন্ধি স্থাপিত হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আমাদের কোন ঠাঁই থাকবে না। তাই যে করেই হোক সন্ধি হতে দিব না। ততক্ষণে হযরত আলী (রা.)'ও পৌঁছে যান। তাঁর পৌঁ ছার দ্বিতীয় দিন তাঁর সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের সময় হযরত আলী (রা.) বলেন, আপনি তো আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু খোদার সমীপে উপস্থাপনের জন্য কোন ওজরও কি প্রস্তুত করে রেখেছেন? আপনারা যারপরনাই কষ্ট সহ্য করে যে ইসলামের সেবা করেছিলেন সেই ইসলামকে কেন আপনারা নিজ হাতে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন? আমি কি আপনাদের ভাই নই? পূর্বে তো পরস্পরের রক্তকে হারাম মনে করা হতো, কিন্তু কি কারণে আজ তা বৈধ হয়ে গেল? যদি কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভব হতো তাহলেও একটি কথা ছিল। যেহেতু নতুন কোন বিষয়ের উদ্ভব হয় নি তাহলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার হেতু কী? তখন হযরত তালহা (রা.) বলেন, [তিনিও হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাথে ছিলেন] হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যার বিষয়ে আপনি প্ররোচনা জুগিয়েছেন। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের প্রতি অভিসম্পাত করি। এরপর হযরত যুবায়ের (রা.)-কে হযরত আলী (রা.) বলেন, তুমি কি ভুলে গেছ, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, খোদার কসম! তুমি আলীর সাথে যুদ্ধ করবে এবং তুমি অন্যায়ের উপর থাকবে। একথা শুনে হযরত যুবায়ের (রা.) নিজ সেনাদলের কাছে ফিরে যান এবং কসম খেয়ে বলেন, তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করবেন না আর তিনি (রা.) স্বীকার করে নেন যে, বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন। এ সংবাদ যখন সেনাবাহিনীর মাঝে ছাড়িয়ে পড়ে তখন সবাই আশ্বস্ত হয় যে, এখন আর যুদ্ধ হবে না বরং সন্ধি হয়ে যাবে; কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা চরম ভয় পেয়ে যায়। রাত নেমে আসার পর তারা সন্ধিকে নস্যাৎ করার জন্য একটি চক্রান্ত করে। তাদের যেসব লোক হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল তারা হযরত আয়েশা, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সৈন্যদের ওপর রাতে অতর্কিতে হামলা করে আর যারা তাদের সেনাদলে ছিল, তারা হযরত আলী (রা.)-এর সেনাদলের ওপর রাতে অতর্কিত আক্রমণ করে, ফলে চারিদিকে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় আর উভয় দল মনে করে যে, অপরপক্ষ তাদের সাথে প্রতারণা করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সাবাপন্থীদের একটি ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন হযরত আলী (রা.)

চিৎকার করে বলেন, কেউ যেন হযরত আয়েশা (রা.)-কে ঘটনা সম্বন্ধে অবগত করে, হয়ত তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর উষ্ট্রী সম্মু খে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু পরিণতি আরো ভয়াবহ হয়। নৈরাজ্যবাদীরা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হতে চলেছে দেখে তারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর উটকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে। হযরত আয়েশা (রা.) উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, 'হে লোকেরা! যুদ্ধ পরিত্যাগ কর আর আল্লাহ্ ও বিচার দিবসকে স্মরণ কর। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা নিবৃত্তহয় নি, বরং তারা নিরন্তর তাঁর উটকে লক্ষ্য করে তির বর্ষণ করতে থাকে। বসরাবাসীরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর চারপাশে থাকা সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা এটি দেখে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে যায় আর উম্মুল মু'মিনীনের সাথে এমন অবমাননাকর আচরণ দেখে তাদের ক্ষোভের কোন সীমা-পরিসীমা রইল না। ফলে, তারা তরবারি খাপমুক্ত করে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর উট যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সাহাবীগণ এবং বড় বড় বীর যোদ্ধারা এর (অর্থাৎ উটের) চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হয়ে যায় এবং একের পর এক নিহত হতে থাকে, কিন্তু উটের লাগাম তারা ছাড়ে নি। হযরত যুবায়ের (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেন নি, বরং অন্য দিকে চলে যান। কিন্তু এক হতভাগা নামাযরত অবস্থায় পেছন থেকে গিয়ে তাঁকে (রা.) শহীদ করে দেয়। হযরত তালহা (রা.) যুদ্ধের ময়দানেই এই নৈরাজ্যবাদীদের হাতে নিহত হন। যখন যুদ্ধ ভয়াবহরূপ ধারণ করে তখন এটি ভেবে যে, হযরত আয়েশা (রা.)-কে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না সরানো পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না, কয়েকজন তাঁর উটের পা কেটে দেয় এবং উটের হওদা বা আসন মাটিতে নামিয়ে রাখে, তখন গিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই ঘটনা দেখে মর্মবেদনায় হযরত আলী (রা.)-এর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু যা কিছু ঘটে গেছে, তাতে তাঁর কিছুই করার ছিল না। যুদ্ধ শেষে নিহতদের মাঝে যখন হযরত তালহা (রা.)-এর লাশ পাওয়া যায়, তখন হযরত আলী (রা.) খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন।

এই পুরো ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত যুদ্ধে সাহাবীদের কোন হাত ছিল না, বরং এই দুষ্কৃতি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে ছিল। আরেকটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) উভয়েই হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বয়আতকারী হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কেননা, তাঁরা উভয়ে নিজেদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিলেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতকারীর হাতে নিহত হয়েছেন। অধিকন্তু হযরত আলী (রা.) তাদের হত্যাকারীদের ওপর অভিসম্পাতও করেন।

(আনওয়ারে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৮-২০১)

উষ্ট্রীর যুদ্ধ এবং হযরত তালহা (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক জায়গায় বলেন, নবীরা যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন প্রাথমিক দিনগুলোতে যারা ঈমান আনয়ন করে, তারাই মহান আখ্যায়িত হয়। মুসলমান মাত্রই জানে যে, মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত সা'দ (রা.) এবং হযরত সাঈদ (রা.) প্রমুখ এমন লোক ছিলেন যাদেরকে মহান বা সম্মানিত মনে করা হতো। কিন্তু তাদেরকে মহান এ কারণে মনে করা হতো না যে তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য পেতেন, বরং ধর্মের জন্য অন্যদের চেয়ে অধিক দুঃখকষ্ট বরণ করেছিলেন বলে তাদেরকে মহান জ্ঞান করা হতো। হযরত তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরও জীবিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত বরণের পর মুসলমানদের মাঝে যখন মতভেদ দেখা দেয় আর এক দল বলে যে, হযরত উসমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত– এই দলের নেতা ছিলেন হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)। কিন্তু অপরপক্ষ বলে যে, মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ মাত্রই মারা যায়, আপাতত আমাদের উচিত সব মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করা, যাতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আমরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিব– এই দলের নেতা ছিলেন হযরত আলী (রা.)। এই মতভেদ এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আয়েশা (রা.) অভিযোগ করেন যে, হযরত আলী ঐসব লোককে আশ্রয় দিতে চান যারা হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করেছিল। অপরদিকে হযরত আলী অভিযোগ করেন যে, তাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ অগ্রগণ্য, ইসলামের লাভ বা স্বার্থের বিষয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। মোটকথা মতভেদ চরম রূপ ধারণ করে। এরপর তাদের মাঝে যুদ্ধও আরম্ভ হয়ে যায় (আর) এমন যুদ্ধ যাতে হযরত আয়েশা (রা.) সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুরুতে বিরোধী দলে ছিলেন এরপর হযরত আলী (রা.)'র কথা শুনে হযরত যুবায়ের পৃথ ক হয়ে যান। অপরজনও মিমাংসা করার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু যারা বিরুদ্ধবাদী ও মুনাফিক অথবা নৈরাজ্যবাদী ছিল তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। যাহোক দুটি দল ছিল যারা ছিল পরস্পর বিবদমান। উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ চলছিল,তখন হযরত তালহা (রা.)'র কাছে একজন সাহাবী আসেন এবং তাকে বলেন, তালহা! তোমার কি স্মরণ আছে, অমুক সময় আমি এবং তুমি বা আমরা দু'জন মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম, তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, তালহা! এমন এক সময় আসবে যখন, তুমি এক বাহীনির অংশ হবে আর আর আলী থাকবে ভিন্ন দলে। আলী সত্যের ওপর থাকবে আর তুমি ভ্রান্তিতে থাকবে। একথা শোনার পর হযরত তালহা (রা.)'র চোখ খুলে যায় এবং তিনি বলেন, আমার একথা মনে পড়েছে। আর তৎক্ষণাৎ তিনি দল থেকে বেরিয়ে চলে যান। মহানবী (সা.)-এর কথা পূর্ণ করার মানসে তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আলী (রা.)'র বাহীনির এক দুর্ভাগা সৈন্য পেছন থেকে গিয়ে তাকে খঞ্জরাঘাতে শহীদ করে। হযরত আলী (রা.) নিজের জায়গায় উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত তালহার খুনী বড় পুরস্কার লাভের বাসনায় ছুটে আসে এবং হযরত আলীকে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাকে আপনার শত্রুর নিহত হওয়ার সংবাদ দিচ্ছি। হযরত আলী (রা.) বলেন, কোন শত্রু? সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তালহাকে হত্যা করেছি। হযরত আলী বলেন, হে দুর্ভাগা! আমিও তোকে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে সংবাদ দিচ্ছি যে, তুই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবি– কেননা আমার ও তালহার উপস্থিতিতে একবার মহানবী (সা.) বলেছিলেন, হে তালহা! তুমি একবার সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে লাঞ্ছনা সহ্য করবে আর তোমাকে এক ব্যক্তি হত্যা করবে কিন্তু খোদা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

এই যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) আর হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের এর সৈন্য সারি যখন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখন হযরত তালহা নিজের অবস্থানের অনুকূলে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দিতে আরম্ভ করেন (এটি সে সময়ের পূর্বের কথা যখন এক সাহাবী তাকে হাদীস স্মরণ করিয়েছিল আর তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, তিনি দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করছিলেন) তখন হযরত আলীর বাহিনী থেকে এক ব্যক্তি বলে হে পঙ্গু, চুপ কর। হযরত তালহার একটি হাত একেবারেই বিকল ছিল, তা কর্মক্ষম ছিল না। সে যখন বলে, হে পঙ্গু চুপ কর, তখন হযরত তালহা (রা.) বলেন, তুমি তো বললে হে নুলো চুপ কর, কিন্তু আমি কীভাবে নুলো হয়েছি তুমি কি জানো? উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের অবস্থা নড়বড়ে ছিল আর মহানবী (সা.)-এর সাথে শুধুমাত্র বারোজন সাথী রয়ে গিয়েছিল, তখন কাফিরদের তিন হাজার সৈন্য আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল আর তারা চতুর্দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর ওপর এই মানসে তির নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে যে, তিনি (সা.) যদি নিহত হন তাহলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। সে সময় কাফির বাহীনির প্রত্যেক সৈন্যের ধনুক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র চেহারা লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করছিল। তখন আমি আমার হাত মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারার সামনে রেখে দিই। কাফির বাহিনীর প্রতিটি তির আমার এই হাতের ওপর পড়ে আর আমার হাত সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে

আমি পঙ্গু হয়ে যাই। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার সম্মুখ থেকে আমি আমার হাত সরাই নি।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ১৪৯-১৫১)

অন্যত্র হযরত তালহার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জামালের যুদ্ধের সময় কেউ বলে যে, সেই পঙ্গু ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এক সাহাবী, যিনি এই কথা শুনছিলেন, তিনি বলেন যে, হে দুর্ভাগা! তুমি কি জান সেই পঙ্গু ব্যক্তি কিভাবে পঙ্গু হলেন বা এক হাত কিভাবে হারালেন। উহুদের যুদ্ধের সময় যখন ভুল বোঝাবুঝির কারণে সাহাবীদের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে যায় আর কাফেররা জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) মাত্র গুটি কতক সাথীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছেন, তখন কাফিরদের প্রায় তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী চতুর্দিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং শত শত তিরন্দাজ ধনুক হাতে নিয়ে মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে নিজেদের তিরের লক্ষ্যে পরিণত করে, যেন তির বর্ষণে সেই পবিত্র চেহারাকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে। তখন যে ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারার সুরক্ষার জন্য নিজেকে সামনে নিয়ে আসেন তিনি ছিলেন হযরত তালহা। তিনি তার হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার সামনে রেখে দেন। আর প্রতিটি আগত তির তাঁর (সা.) চেহারায় আঘাত করার পরিবর্তে তালহার হাতে আঘাত করতে থাকে। এভাবে অনবরত তির বর্ষিত হতে থাকে এবং সেই ক্ষত আর সামান্য ক্ষত থাকে নি বরং ক্ষতের আধিক্যের কারণে তালহার হাতের পেশী নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এবং তার হাত অকেজো হয়ে যায়। যাকে তুমি তাচ্ছিল্যের সাথে পঙ্গু বলছ তার পঙ্গু হওয়া এমন নেয়ামত যার বরকত লাভের জন্য আমাদের প্রত্যেকে আকুল হয়ে আছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৬, পৃ: ৩৮৬, প্রদত্ত খুতবা, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)

রবী বিন হিরাশ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আমি হযরত আলীর কাছে বসেছিলাম। তখন ইমরান বিন তালহা আসেন। তিনি হযরত আলীকে সালাম করেন। হযরত আলী তাকে বলেন, সুস্বাগতম হে ইমরান বিন তালহা। ইমরান বিন তালহা বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে সুস্বাগতম বলছেন অথচ আপনি আমার পিতাকে হত্যা করেছেন আর আমার সম্পদ হরণ করেছেন। হযরত আলী বলেন, তোমার সম্পদ বায়তুল মালে পৃথক রাখা আছে। সকালে নিজের সম্পদ নিয়ে যেও। অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি তা এজন্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলাম যেন কোথাও মানুষ তা ছিনিয়ে না নিয়ে যায়। আরবাকি রইল তোমার এই কথা যে, আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি, সেক্ষেত্রে আমি আশা করি, আমি এবং তোমার পিতা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হব যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (সূরা হিজর: ৪৮) অর্থাৎ আমরা তাদের বক্ষে যে বিদ্বেষ রয়েছে তা দূর করে দিব, তারা ভাই ভাই হিসেবে উচ্চ আসনে মুখোমুখি উপবিষ্ট থাকবে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৯)

মুহাম্মদ আনসারী নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি হযরত আলীর কাছে এসে বলে যে, তালহার হত্যাকারীকে ভেতরে আসার অনুমতি দিন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আলীকে বলতে শুনেছি যে, এই হত্যাকারীকে জাহান্নামের সংবাদ প্রদান কর।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৯)

হযরত তালহা শহীদ হলে হযরত আলী যখন তাকে মৃত অবস্থায় দেখেন তখন তার অর্থাৎ হযরত তালহার চেহারা থেকে মাটি পরিষ্কার করেন এবং বলেন, হে আবু মুহাম্মদ! আকাশের নক্ষত্ররাজির নীচে তোমাকে ধূলামলিন অবস্থায় দেখা আমার জন্য খুবই কষ্টকর। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমার দোষত্রুটি এবং দুঃখের ফরিয়াদ করছি। অর্থাৎ হযরত আলী বলেন, আমি খোদার দরবারে নিজের দোষত্রুটি এবং দুঃখের ফরিয়াদ করছি। এরপর তিনি হযরত তালহার জন্য রহমতের দোয়া করেন আর বলেন, হায়, আমি যদি এ দিন দেখার বিশ বছর পূর্বে মৃত্যু বরণ করতাম! তখন হযরত আলী এবং তাঁর সাথীরা অনেক কাঁদেন। হযরত আলী একবার এক ব্যক্তিকে এই পঙক্তি পাঠ করতে শুনেন যে,

ফাতান কানা ইউদনিহিল গিনা মিন সাদিকে

ইযা মা হুয়াসতাগনা ওয়া ইয়ুবিদুহুল ফাকার

অর্থাৎ সে এমন এক যুবক ছিল যে সম্পদশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকত আর অসচ্ছলতার যুগে তাদেরকে এড়িয়ে চলত। হযরত আলী (রা.) বলেন, এই পঙক্তির সত্যায়নস্থল ছিলেন আবু মুহাম্মদ তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করুন। এখানে তার স্মৃতিচারণ শেষ হলো।

এখন বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর একটি উদ্বৃতিও আমি পাঠ করছি। একবার তিনি (আ.) মুফতি সাহেবকে বলেন,

বাড়িঘর আলোকিত রাখুন। (এটি প্লেগের দিনের কথা) আজকাল ঘর খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। পোশাক ইত্যাদিও পরিষ্কার রাখা উচিত। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, আজকাল

বড় কঠিন দিন এবং বাতাস বিষাক্ত। তাছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সুন্নতও বটে। পবিত্র কুরআনেও লেখা আছে,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - (সূরা আল মুদ্দাস্‌সের: ৫-৬)

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৩-২৭৪)

এরপর অপর এক স্থানে তিনি বলেন, যাদের শহর ও গ্রামে প্লেগ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তারা যেন নিজ শহর থেকে অন্যত্র গমন না করে। নিজেদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করুন এবং তা উষ্ণ রাখুন। আর বিপদের পূর্ব প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সত্যিকার তওবা করুন। পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সন্ধি করুন। রাতে উঠে তাহাজ্জুদে দোয়া করুন। এরপর তিনি বলেন, নিজেদের অবস্থায় বাস্তব এবং সত্যিকার পরিবর্তনই আল্লাহ্‌র এই শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে, ওয়ালা নি'মা মা ক্বীলা।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৪)

আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার তৌফিক দিন। সরকারের নির্দেশনা মেনে চলুন। ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখুন। ধূপ জ্বালানো উচিত। ডেটল ইত্যাদিও স্প্রে করতে থাকুন, তা সহজলভ্য। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি কৃপা ও করুণা করুন। যাহোক এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।

****

রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

"আমাদের দেহে দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয়, তা দূর করার জন্য আরেকটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য তিনি দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্য রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লা তার সামনে এলেও তাঁকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকটাত্মীয় সম্মুখে দাঁড়ালেও সে তাকে চিনতে পারে না। অনেকে মনে করে, তারা রোযা রেখে খোদার বড়ই উপকার করেছে। এরূপ মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক যখন কোন রুগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করলে যদি সে রুগী মনে করে যে সে রক্ত দিয়ে ডাক্তারের উপকার করেছে তা হলে তার থেকে বড় নির্বোধ আর কে আছে? ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রুগীর জন্য কল্যাণজনক। তদ্রুপ যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা'লার কোন উপকার করে না, বরং এটা তার উপর খোদার অনুগ্রহ যে তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এ দিনগুলির যত বেশি সদ্ব্যবহার করব, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে যেগুলি ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।"

(আল-ফযল, ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫)

হযরত মহম্মদ (সা.)-এর প্রাথমিক জীবন

উর্দূ থেকে অনুদিত **(দ্বিতীয় পর্ব)**

মক্কার কুরায়েশরা এত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার প্রতি কোন গুরুত্ব দিত না। হিদায়তের সূর্য উদিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা চোখ বন্ধু করে বসে ছিল। বরং তারা নির্বোধের মত ধারণা করত যে, ফু দিয়ে সূর্যকে নিভিয়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু এটি ছিল সূর্য যা আল্লাহ্ তা'লার আদেশে পৃথিবীকে আলাকিত করতে উদিত হয়েছিল। মক্কাবাসীরা প্রতিদিন মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে দেখে হিংসায় জ্বলে যেত। কিন্তু তারা কোন চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ভয় পেত। কেননা, সেখানে গোষ্ঠী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একটি গোষ্ঠী যদি অপর গোষ্ঠীর কোন সদস্যের সঙ্গে খারাপ আচরণ করত তবে গোটা গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) এর সম্পর্ক ছিল বনু হাশিম গোত্রের সঙ্গে, প্রথমে যার নেতৃত্ব ছিল আব্দুল মোতালেবের কাছে। তাঁর মৃত্যুর পর আবু তালেব সর্দার হন। মক্কার কুরায়েশদের ভয় ছিল যে, যদি মহম্মদের প্রাণশঙ্কা দেখা দেয় তবে বানু হাশিম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধ করবে। বানু হাশিম যদি মহম্মদ (সা.)-কে সমর্থন করা থেকে সরে আসে তবে আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। এই উদ্দেশ্যে মক্কার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ওলীদ বিন মুগায়রা, আস বিন ওয়ায়েল, উতবা বিন রাবিয়া, আবু জাহেল , আবু সুফিয়ান ও প্রমূখ দলবদ্ধভাবে আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হয়। সবিনয় নিবেদন করে যে, আপনার ভাইপোর নতুন ধর্মের কারণে শহরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ঘনিয়েছে। আপনি তার সমর্থন থেকে সরে দাঁড়ান। আমরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিব। আবু তালেব তাদের সঙ্গে বিনম্রতার সঙ্গে কথা বললেন এবং তাদের ক্রোধ প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। অবশেষে তাদেরকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠান।

(ইবনে হিশশাম, সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

"এর পর মক্কার সর্দাররা দেখল যে তাদের নিজের ঘর থেকেই এমন লোক বেরিয়ে আসছে যারা মূর্তির ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করছিল এবং প্রকাশ্যে এক খোদার উপাসনা করছিল। এটি তাদের সহন সীমার বাইরে ছিল। তাই তারা একসঙ্গে হযররত রসূলে করীম (সা.)-এর চাচা আবু তালেবের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমরা আপনার কারণে আপনার ভাইপোকে কিছু বলি নি। কিন্তু এখন বিষয়টি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সে আমাদের মূর্তিগুলির অবমাননা করছে। অতএব, আপনি তাকে বোঝান এবং এই পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করুন, নচেত আমরা কেবল তার সঙ্গেই নয় আপনাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধে করব এবং আপনাকে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করব।

আবু তালেবের জন্য নেতৃত্ব ত্যাগ করা অত্যন্ত অপ্রীতিকর বিষয় ছিল। তিনি কুরায়েশদের সর্দারের কাছে নিজের ভাইপোকে বোঝানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তাদের চলে যাওয়ার পর আবু তালেব হযরত রসূলে করীম (সা.) কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বললেন-

হে আমার ভাইপো! জাতি তোমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। খুব সম্ভব তোমার সাথে আমাকেও তারা ধ্বংস করে দিবে। আমি তোমার প্রতি সহানুভুতি এবং তোমার মঙ্গল কামনা করে বলছি, মূর্তিদেরকে দোষারোপ করো না। নচেত আমি পুরো জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি রাখি না।

আবু তালেব যখন এই কথা গুলি বলছিল, তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। তাকে এমন দুঃখভারাক্রান্ত দেখে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি (সা.) বললেন,

খোদার কসম! এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদকে রেখে দেয় তবুও আমি সেই কাজ থেকে নিবৃত হতে পারি না যার জন্য খোদা তা'লা আমাকে দাঁড় করিয়েছেন। হে আমার চাচা! যদি আপনি নিজের দুর্বলতা এবং কষ্টের কথা চিন্তা করেন তবে অবশ্যই আমাকে আশ্রয় দেওয়া থেকে নিরস্ত হন। আমি খোদার তৌহিদের প্রচার থেকে কোনও ভাবেই বিরত থাকতে পারি না। আমি এই কাজেই নিয়োজিত থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা আমাকে মৃত্যু দান করেন।

আবু তালেবের উপর হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর এই কথার এত প্রভাব হল যে, তিনি বললেন-

হে আমার ভাইপো! তুমি নিজের কাজে মগ্ন থাক। আমার জাতি যদি আমাকে ত্যাগ করে তো করুক, আমি তোমাকে ত্যাগ করতে পারব না।

(সীরাত ইবনে হুশশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৮)

এই ঘটনাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইলহামের মাধ্যমে পুরো ঘটনা এবং কথপোকথন সম্পর্কে অবগত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন-

"আবু তালেবের এই ঘটনাটি যদিও অনেক পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই পুরো লিখিত অংশটি ইলহামী যা খোদা তা'লা এই অধমের হৃদয়ের অবতীর্ণ করেছেন। কেবল ব্যাখা স্বরূপ কয়েকটি বাক্য এই অধমের পক্ষ থেকে ।

আসুন এই ইলহামী অংশটুকু পাঠ করি-

" যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, মুশরিকগণ অপবিত্র, নিকৃষ্টতম জীব, নির্বোধ, শয়তানের বংশধর এবং তাদের উপাস্য জাহান্নামের ইন্ধন ও অংশ তখন আবু তালেব আঁ হযরত (সা.)-কে ডেকে বলেন-

হে আমার ভাইপো! তোমার গাল-মন্দ শুনে জাতি বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। খুব সম্ভব তারা তোমাকে ধ্বংস করে দিবে এবং তার সঙ্গে আমাকে। তুমি তাদের জ্ঞানীজনদেরকে নির্বোধ আখ্যায়িত করেছ এবং তাদের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিকৃষ্টতম জীব বলেছ। তাদের সম্মানীয় উপাস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন ও ইন্ধন বলেছ। এবং সকলকে অপিত্র এবং শয়তানের বংশধর বলেছ। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি যে, নিজের ভাষাকে সংযত কর এবং গাল-মন্দ থেকে বিরত হও। নচেত আমি পুরো জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি রাখি না।

আঁ হযরত (সা.) উত্তরে বললেন-

হে চাচা! এটি গাল-মন্দ নয়। বরং এটি হল সত্য উদ্ঘাটন এবং যথোচিত বর্ণনা। এই কাজের জন্যই তো আমি প্রেরিত হয়েছি। এর কারণে যদি আমার মৃত্যুও আসে তথাপি আমি সানন্দে নিজের জন্য সেই মৃত্যুকে বরণ করব। আমার জীবন এই পথেই উৎসর্গিত। আমি মৃত্যুর ভয়ে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত হতে পারি না।

হে চাচা! যদি তুমি নিজের দুর্বলতা ও কষ্টের কথা চিন্তা কর তবে আমাকে আশ্রয় প্রদান করা নিরস্ত হও। খোদার কসম! আপনাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি খোদার আদেশ পৌঁছানোর কাজে কখনো থেমে থাকব না। খোদার আদেশ আমার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয়। খোদার কসম! যদি আমি এই পথে মৃত্যু বরণ করি, তবে এই আকাঙ্খাই পোষণ করি যেন পুনরায় জীবিত হয়ে চিরকাল এই পথেই মৃত্যু বরণ করতে থাকি। এটিই ভীতির স্থল নয়। বরং তাঁর পথে দুঃখ সহন করার মধ্যে আমি অসীম আনন্দ খুঁজে পায়।

আঁ হযরত (সা.) এই বক্তব্য রাখছিলেন তখন তাঁর চেহারায় সত্য ও জ্যোতির আভা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তাঁর (সা.) বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সত্যের জ্যোতিঃ দেখে আবু তালেবের চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে যেতে লাগল। তিনি বললেন-

আমি তোমরা এই মহান রূপ সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। তুমি অসাধারণ গুণ ও নিদর্শনের আধার। যাও! নিজের কাজে মগ্ন হয়ে পড়। যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত আছি, যতদুর পর্যন্ত আমার শক্তি আছে, তোমার সঙ্গ দিব।

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

(ইযলায়ে আওহাম, পৃষ্ঠা: ১৬-১৮)

মক্কার কুরায়েশরা এই প্রচেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়। কিন্তু তারা বিরোধীতা থেকে সরে আসে নি। তারা আরও একটি ষড়যন্ত করল। আমারা বিন ওলীদ নামে কুরায়েশদের উচ্চ বংশের একজন সুযোগ্য যুবককে সঙ্গে নিয়ে তারা আবু তালেবের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল- " আমরা আমারা বিন ওলীদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি । তুমি নিশ্চয় জান যে, কুরায়েশদের সর্বশ্রেষ্ট যুবকদের মধ্যে একজন। তুমি মহম্মদের পরিবর্তে এই যুবককে নাও এবং এর থেকে নিজের মত ইচ্ছামত কাজ নিতে পার। তুমি চাইলে একে নিজের পুত্র হিসেবেও গ্রহণ করতে পার। এর উপর আমাদের যাবতীয় অধিকার থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এর পরিবর্তে মহম্মদকে আমাদের কাছে দিয়ে দাও। সে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে আমাদের জাতিতে এক নৈরাজ্য ছড়িয়েছে। 'একটি প্রাণের পরিবর্তে আরেকটি প্রাণ'- এই শর্তটিও পুরণ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরও কোনও আপত্তি থাকবে না।

আবু তালেব বললেন, এটি তো অদ্ভুত বিচার ! আমি তোমাদের ছেলেকে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করব এরপর তাকে খাওয়াব-পরাব, আর পরিবর্তে তোমাদেরকে আমার ছেলে এই জন্য দিব যেন তোমরা তাকে হত্যা কর! খোদার কসম! এটি কক্ষনও হবে না।

(ইবনে হুশশাম, তিবরী, সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

এইভাবে কুরায়েশরা আরও একবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু তারা মনঃস্থির করছিল যে, এখন যাই ঘটুক না কেন, আবু তালেব তো কোন অবস্থাতেই রাজি হচ্ছেনা। তাই আমাদেরকেই ব্যবস্থা নিতে হবে, আমরা যে কোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।

মক্কার কুরায়েশরা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল, অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'লাও নিজের ভালবাসা এবং ভবিষ্যতের সফলতার সুসংবাদ অবিরাম ধারায় দিতে থাকলেন। এখন আমরা নবুয়তের পঞ্চম বছরের শওয়াল মাসের পূর্বের একটি বড় ঘটনার দিকে যাব। এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের একটি ঘটনা।

একদিন রাতে আঁ হযরত (সা.) মসজিদে হারামের সেই বিশেষ অংশে শুয়ে ছিলেন যেটিকে হামীম বলা হয়। তিনি (সা.) অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর চোখদুটি বন্ধ ছিল কিন্তু হৃদয় জাগ্রত অবস্থায় ছিল। সেই অবস্থায় তিনি (সা.) হযরত জিবরাঈল (আ.) কে আবির্ভুত হতে দেখলেন। তিনি মহম্মদ (সা.) কে সঙ্গে নিয়ে আকাশের দিকে আরোহন করলেন। প্রথম আকাশে তিনি (সা.) হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা (আ.)-এবং হযরত এহিয়া (আ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম আকাশে যথাক্রমে হযরত ইউসুফ, হযরত ইদরীস এবং হযরত হারুন (আ.)-কে তিনি (সা.) দেখেন। ষষ্ঠ আকাশে তিনি (সা.) হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতে পর তিনি (সা.) অগ্রসর হলে হযরত মূসা (আ.) কেঁদে ফেলেন। তখন একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল যে, হে মূসা কেন কাঁদছ? হযরত মূসা উত্তর দিলেন- হে আল্লাহ্! এই যুবক আমার পশ্চাতে এল, কিন্তু এর উম্মত আমার উম্মতের থেকে বেশি জান্নাতে যাবে। হে আল্লাহ্! আমি জানতাম না যে আমার পশ্চাতে এসে কোন ব্যক্তি আমার থেকে এগিয়ে যাবে। এর পর সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। এই স্থানের থেকে আগে ছিল হযরত রসুল করীম (সা.)-এর স্থান। এতদূর পর্যন্ত এর পূর্বে না কেউ পৌঁছাতে পেরেছে আর না কেউ কখনো পৌঁছাতে পারবে। এই স্থানে একটি কূলের গাছ ছিল। এরপর তাঁকে জান্নাত ঘুরে দেখানো হয়। জিবরাঈল (আ.)কে তিনি আসল চেহারায় দেখেছিলেন। তাঁর ছ'শটি ডানা ছিল।

অবশেষে তিনি (সা.) নিজেকে মহাপরাক্রমশালী খোদার দরবারে উপস্থিত দেখেন। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তাঁর সরাসরি কথপোথন হয়। এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে কয়েকটি সুসংবাদ প্রদান করেন। তাঁর নামাযের জন্য দিনে পঞ্চাশ বার নামায ধার্য করা হয় যা অনুরোধ করে তিনি পাঁচ ওয়াক্তে কমিয়ে আনেন। এরপর বিভিন্ন আকাশমন্ডলী অতিক্রম করে তিনি (সা.) নীচে নেমে আসেন। ঠিক সেই সময়ই তাঁর চোখ খুলে যায়। দিব্যদর্শনের এই অবস্থাটি ক্রমেই দূর হতে থাকে এবং দেখেন যে তিনি (সা.) মসজিদে হারামে শুয়ে আছেন।

(বুখারী, কিতাবুস সালাত ও কিতাব বাদাউল হাক ও কিতাবুত তওহীদ)

হাবশার দিকে হিজরত

এটি ছিল নবুয়তের পঞ্চম বছর। মক্কাবাসীদের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের কারণে ইসলাম প্রচারের কাজ দুরূহ হয়ে উঠছিল। প্রারম্ভিককালে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। এই কারণে তারা মক্কাবাসীদের হাতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তারা বল প্রয়োগ করছিল। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠছিল সেখানে ইসলামের শিক্ষার প্রচার করা অত্যন্ত অসাধ্য বিষয় ছিল। এমন অসহায় পরিস্থিতি আঁ হযরত (সা.) একদিন সমস্ত সঙ্গীদের একত্রিত করলেন এবং অত্যন্ত গোপনভাবে তাদেরকে কিছু কিছু সংখ্যায় মক্কা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি (সা.) পশ্চিমের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন-

" পশ্চিমে সমুদ্র পার করে একটি ভূ-খণ্ড আছে যেখানে খোদার ইবাদতের কারণে কারোর উপর অত্যাচার করা হয় না। সেখানে একজন ন্যায়-বিচারক সম্রাট আছেন। তোমরা দেশ ত্যাগ করে সেই দেশে চলে যাও। হয়তো তোমাদের জন্য সচ্ছলতা সৃষ্টি হবে।"

সেই দেশটি বলতে তিনি (সা.) হাবশাকে বুঝিয়ে ছিলেন। হাবশাকে ইথিওপিয়া এবং আবি সিনাও বলা হয়ে থাকে। এটি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। দক্ষিণ আরব থেকে লোহিত সাগর পার করে তার ঠিক বিপরীত প্রান্তে এই দেশটি। হাবশার বাদশাকে নাজাশি বলা হত। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে যে নাজাশি ছিলেন তাঁর নাম হল আসমাহ। তিনি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রকৃতিগত দিক তিনি থেকে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং খোদাভীরু মানুষ ছিলেন। আঁ হযরত (সা.) আশা করেছিলেন মুসলমানরা সেখানে শান্তিতে থাকবে এবং মক্কার তুলনায় সেখানে নির্ভীক হয়ে ইসলামের প্রচার করবে। নিজেদের দেশ ছেড়ে গোপনে অন্য দেশে যাওয়া সহজ কাজ ছিল না। প্রতিটি পদক্ষেপে প্রাণের শত্রুরা ওত পেতে ছিল। শত্রুরা যাতনা দেওয়ার কোন সুযোগই হাত ছাড়া করত না। এমতাবস্থায় যদি তারা ঘুণাক্ষরেও জানত পারত যে মুসলমানরা তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তবে এক মহা অঘটন ঘটে যেত। দ্বিতীয়ত মুসলমানরা মক্কভূমিকে যারপরনায় ভালবাসত। মক্কা ছেড়ে সাজ-সরঞ্জামহীন অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে ছিল সব থেকে বড় সহায় ও অবলম্বন আল্লাহ্ এবং হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর দোয়া। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী করা হয় এবং নবুয়তের পঞ্চম বছরে রজব মাসের একরাতে নিজেদের ঘরবাড়ি, সাজ-সরঞ্জাম এবং আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করে খোদার খাতিরে হিজরত করার জন্য মক্কা থেকে তারা রওনা হল। যাত্রাটিকে গোপন রাখার জন্য ভোরের নামাযের পূর্বের সময়টি বেছে নেওয়া হল।

মক্কার মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত যে, রাত্রিকালে মক্কার কিছু সর্দার শহর পরিক্রমা করত যাতে চুরি-ডাকাতির ঘটনা না ঘটে। সেই রাতে হযরত ওমর (রা.) শহর পরিক্রমা করছিলেন। তিনি দেখেন একটি জায়গায় মালপত্র বেঁধে রাখা হয়েছে এবং এর পাশে উম্মে আব্দুলুল্লাহ্ নামে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। হযরত ওমর (রা.) আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- উম্মে আব্দুল্লাহ্ এগুলি তো হিজরত করার মালপত্র মনে হচ্ছে। উম্মে আব্দুল্লাহ উত্তর দিল-

হ্যাঁ খোদার কসম! আমরা অন্য কোন দেশে চলে যাব। কেননা, তোমরা আমাদেরকে অনেক দুঃখ ও যাতনা দিয়েছ। আমরা ততদিন পর্যন্ত না দেশে ফিরব যতদিন পর্যন্ত না খোদা তা'লা আমাদের জন্য কোন সচ্ছলতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১২২)

হযরত ওমর দৃঢ় মনের একজন সুঠাম যুবক ছিলেন। কিন্তু এই কথা শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন-

উম্মে আব্দুল্লাহ যাও। খোদা তোমাদের রক্ষক হোক।

তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল। আবেগতাড়িত হয়ে কেঁদে না ফেলেন, এই কারণে তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। এমন সময় সেই সাহাবীয়ার স্বামী সেখানে এসে পৌঁছায়। ওমরকে নিজের স্ত্রী এবং মালপত্রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি ঘাবড়ে যান। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এখন হয়তো এই খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কিন্তু উম্মে আব্দুল্লাহ্ তাঁর স্বামীকে বলল, ওমর খোদা হাফিয বলছে এবং তাঁর কণ্ঠ কান্নাভেজা ছিল। এর থেকে মনে হয় যে, এখন ওমর থেকে কোন বিপদ নেই।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪০)

সকাল হওয়ার পূর্বেই মুহাজিরগণ সমুদ্রতটে এসে একত্রিত হলেন। প্রথম যাত্রীদলে মোট চারজন মহিলা এবং দশ জন পুরুষ ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.)এর কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা.) এবং তাঁর স্বামী হযরত উসমান বিন উফফান(রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) হযরত যুবের বিন আল আওয়াম (রা.), হযরত মাসআব বিন উমের (রা.) হযরত আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত সালমা (রা.)।

(ইবনে হুশ্শাম)

আল্লাহ্ তা'লার অপার মহিমা! শাইয়া বন্দরে হাবাশার পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দু'টি জাহাজ প্রস্তুত ছিল। এই দু'টি ছিল বানিজ্যিক জাহাজ। এই কারণে যাত্রীদের ভাড়াও ন্যায্য হারে নিয়ে জাহাজ দুটি রওনা দেয়।

সকালে সূর্যোদয়ের পর যখন এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান হাত থেকে চলে গেছে, তখন তারা কয়েকজনকে বন্দরকে দিকে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তখন কিছুই করার ছিল না। সেই সকল সৌভাগ্যবান মুসলমানদেরকে নিয়ে জাহাজ দুটি সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দিয়েছিল। মক্কা বড় বড় নেতারা মনে করল " মুসলমানদের একটি দলকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া আমাদের সফলতা বলে গণ্য হতে পারে না। বরং এটি আমাদের পরাজয়ের প্রতীক। কেননা এরফলে ইসলামে দু'টি কেন্দ্র স্থাপিত হল এবং মক্কা থেকে বেরিয়ে একটি জাতির পরিবর্তে দু'টি জাতির মধ্যে প্রচার আরম্ভ হয়ে গেল। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে এবং খৃষ্টানজাতির মধ্যে। এর সাথেই তাদের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছাল যে, তারা শান্তিতে আছে, তাদেরকে কেউ মারেও না আর কোন প্রকারের যাতনাও দেয় না বরং তারা স্বচ্ছন্দে ইবাদত করে এবং পরিশ্রম করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে, তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করল যে, বিরাট ভুল হয়ে গেছে।"

(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩)

সুতরাং তারা নিজেদের ভুল সংশোধন করার জন্য উমর বিন আল আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়া-কে নাজাশি ও তাঁর দরবারীদের জন্য প্রচুর উপঢৌকন সহকারে হাবশার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে যাতে তারা কোন না কোন ভাবে নাজাশিকে রাজি করে মক্কার মুহাজিরদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সেই প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়ে সভা পরিষদবর্গকে উপহার সামগ্রী দিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে এবং এইভাবে তারা নাজাশী বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছানো পথ তৈরী করে। বাদশার তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় দিলে এই প্রতিনিধি দলটি স্বমহিমায় দরবারে উপস্থিত হয় এবং বাদশার সমীপে মূল্যবান উপহার সামগ্রী পেশ করে। অবশেষে তারা নিজেদের আগমণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে।

" হে সম্রাট! আমাদের কয়েকজন নির্বোধ লোক নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে একটি নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করেছে যা আপনার ধর্মেরও বিরোধী। তারা আমাদের দেশে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সেখান থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আমাদের আবেদন হল আপনি তাদেরকে আমাদের সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিন।"

সভা পরিষদবর্গ সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থন করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বাদশাহ অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন এবং আবেদন শুনেই একতরফা সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরিবর্তে বললেন-

" এরা আমার আশ্রয়ে এসেছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি স্বয়ং তাদের কথা না শুনি কিছু বলা সম্ভব নয়। "

সুতরাং মুসলমান মুহাজিরদেরকে সভায় ডাকা হয়। তাদেরকে নাজাশি বাদশা জিজ্ঞাসা করেন-

" ব্যাপারটি কি এবং তোমরা কোন্ নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করেছে? "

মুসলমানদের পক্ষ থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা.) উত্তর দিলেন-

" হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞ ছিলাম। মূর্তিপূজাই ছিল আমাদের ধর্ম। মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম। ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতাম। আমাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ছিল তারা দুর্বলদের অধিকার আত্মসাৎ করত। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দিকে একজন রসুল প্রেরণ করলেন যার পবিত্রতা, সত্যতা এবং বিশ্বসনীয়তা সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে একত্ববাদ শিখিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা করা থেকে নিরস্ত করেছেন। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার, বিশ্বস্ততা, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ব্যাভিচার ও অনাথদের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং খুনাখুনিক করা থেকে বিরত রেখেছেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁকে অনুসরণ করেছি। কিন্তু এই কারণে জাতি আমাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। এরা আমাদেরকে যাবতীয় প্রকারের কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমাদের বিভিন্ন উপায়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে এই ধর্ম থেকে জোর করে বাধা দিতে চেয়েছে। অবশেষে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করে আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছি। অতএব হে বাদশাহ! আমরা আশা করি আপনার অধীনে আমাদের উপর জুলুম হবে না। "

নাজাশি এই কথা শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং হযরত জাফর (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন;-

" যে বাণী তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেটি আমাকে শোনাও।"

হযরত জাফর (রা.) অত্যন্ত সুললতি কণ্ঠে সুরা মরিয়মের প্রারম্ভিক আয়াত পাঠ করে শোনান।

হযরত জাফর এমন বেদনাতুর কণ্ঠে এই আয়াতগুলি তিলাওয়াত করলেন যে, নাজাশির চোখ দিয়ে অশ্রু ধারা বয়ে যায়। তিনি কেবল কণ্ঠস্বরের প্রভাবে বিগলিত হন নি বরং উক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনায় ইসলামী ধর্মবিশ্বাস এবং হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাদশাহ বললেন-

" খোদার কসম! এই বাণী এবং আমাদের মসীহ্র বাণী একই নুরের উৎসের কিরণ বলে প্রতিভাত হয়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ১৫৪)

বাদশাহ কুরায়েশদের দেওয়া উপহার তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করলেন। প্রতিনিধি দলটি বিমর্ষ মুখে ফিরে গেল, কিন্তু তারা হার মানল না। পরের দিন সভায় পুনরায় উপস্থিত হল। এবার উমর বিন আস বলল-

বাদশাহ কি একথা কি জানেন যে এরা হযরত মসীহ সম্পর্কে কি বলে?

বাদশাহ একতরফা সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরিবর্তে মুসলমানদের মুখ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করে নেওয়াকে উত্তম মনে করলেন। তিনি মুসলমানদের ডেকে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

পাঠালেন।

বাদশার পক্ষ থেকে ডাক শুনে মুসলমানরা কিছুটা চিন্তিত হল, কেননা তারা হযরত মসীহ (আ.)-কে সাধারণ মানুষ জ্ঞান করত, খোদার পুত্র বলে স্বীকার করত না। কিন্তু মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সত্য কথাই বলবে। একমাত্র খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত এবং তাঁর উপরই আস্থা রাখা উচিত। সুতরাং তারা পরের দিন সভায় উপস্থিত হলে হযরত জাফর বিন তায়ার (রা.) দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস উপস্থাপন করলেন।

" হে বাদশাহ! আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে হযরত মসীহ (আ.) খোদা তা'লার একজন বান্দা, তিনি খোদা নন। কিন্তু তিনি খোদার অত্যন্ত নৈকট্যভাজন এক রসূল এবং তিনি আল্লাহ্ তা'লার সেই বাণীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করেছেন যা তিনি মরিয়মের মধ্যে ফুৎকার করেছিলেন।"

নাজাশি একটি তৃণখণ্ড হাতে উঠিয়ে বললেন-

খোদার কসম! যা কিছু তুমি বর্ণনা করেছ আমি হযরত মসীহ (আ.)-কে তার থেকে এই তৃণখণ্ডের সমানও বেশি মনে করি না।

নাজাশির এই বিবৃতি শুনে খৃষ্টান পাদরী অত্যন্ত ক্ষুন্ন হল। বাদশাহ্ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বললেন-

যখন আমার পিতা মারা যায় তখন আমি ছোট ছিলাম। তোমরা আমার চাচার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সাম্রাজ্যকে দখল করতে চেয়েছিলে। সেই সময় খোদা আমার অনুগ্রহবশতঃ আমাকে শক্তি প্রদান করেন এবং তিনি তোমাদেরকে পরাজিত করে আমাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। যে খোদা আমাকে সেই অসহায় অবস্থায় স্ম্রাটের আসনে বসিয়েছেন এবং আমার শত্রুদের ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছেন, সেই খোদার সাহায্যের উপর আজও বিশ্বাস আছে। আজ আমাকে তিনি শক্তি প্রদান করেছেন। আমি তাঁর নির্যাতিত বান্দাদেরকে সাহায্য না করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারব না। তোমরা অসন্তুষ্ট হলেও আমি তাদেরকে এখান থেকে বের করে দিব না।

(তারিখুল খামিস, ১ম খণ্ড- তফসীরে কবীর ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬-৪৮)

"সেই দলটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে মক্কাবাসীরা মুসলমানদেরকে ফেরত আনার অন্য একটি ফন্দি আঁটল। হাবশা অভিমুখে গমনকারী কয়েকটি যাত্রীদলের মধ্যে এই সংবাদ রটিয়ে দেওয়া হল যে, মক্কার সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। হাবশার মুসলমানগণ এই সংবাদ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ মুসলমান মক্কায় ফিরে আসে। কিন্তু মক্কা পৌঁছে তারা জানতে পারল যে, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই সংবাদ ছড়ানো হয়েছিল এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই। এরপর কিছু লোক হাবশায় পুনরায় ফিরে যায় এবং কিছু সংখ্যা মুসলমান মক্কায় থেকে যায়।"

(দিবাচা তফরীরুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১১২)

যারা মক্কায় ফিরে এল মক্কাবাসী তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করল। তাদের উপর অত্যাচার করত কিন্তু মক্কা ছেড়ে চলে যেতেও দিত না। কষ্টসহকারে কয়েকটি দল মক্কা ছেড়ে চলে যেত। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রায় একশ জন মুসলমান মক্কা ছেড়ে চলে যেতে সক্ষম হয়। আঁ হযরত (সা.) মক্কায় হিজরত করার সময় কিছু মানুষ পুনরায় ফিরে আসে এবং অন্যান্য যারা অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে তিনি (সা.) ৭ হিজরীতে ডেকে নেন।

বর্ণনা অনুসারে নাজাশি বাদশা পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিল।

(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ,পৃষ্ঠা: ৫)

রসুল করীম (সা.) নাজাশি বাদশার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর তাঁর জানাযা পড়েছিলেন এবং মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেছিলেন।

(শিবলী, পৃষ্ঠা: ২২১)

এই সময়টি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লার উপর একবার ঈমান আনার পর দুঃখ-যন্ত্রণার দরজা খুলে যেত, কিন্তু মুসলমানরা এই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ভয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবার ত্যাগ করে নি বরং প্রত্যেক বিপদ ও পরীক্ষার সময় তাদের ঈমান আরও বেশি দৃঢ় হয়েছে। মুসলমানদের উপর আগত যে সমস্ত বিপদাবলীর কথা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলিই এত বেশি যে শুনলে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে সেই সমস্ত বিপদাবলী হয়তো এর থেকে অনেকগুণ বেশি ছিল। পরিবারের কোন সদস্যকে বিভিন্নভাবে যাতনা দেওয়া হতে থাকলে অন্যরাও শান্তিতে থাকতে পারে না। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তারা কোন প্রকারের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিল না। হযরত রসূলে করীম (সা.) তাদেরকে কেবল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষার উপর জোর দিতেন এবং ধৈর্য্যের প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সুসংবাদ শোনাতেন। এই সুসংবাদ শুনে তারা সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যেত। এই কারণেই মুসলমানরা যাবতীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেছে কিন্তু তওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি। হযরত উসমান (রা.) বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন এবং তিনি (রা.) স্বচ্ছল জীবনযাপন করছিলেন। মক্কার মানুষদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করা এত বড় অপরাধ ছিল যে, তাঁর চাচা হাকাম বিন আবুল আস তাঁকে দড়িতে বেঁধে মেরেছেন। এই অত্যাচার সহ্য করেছেন কিন্তু হযরত উসমান (রা.) কোন কথা বলেন নি, কেবল আল্লাহকে স্মরণ করেছেন।

(তাবকাত ইবনে সাআদ)

একবার একব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সা.) -এর গলায় গামছা দিয়ে এত জোরে টান মারে যে, তাঁর (সা.)-এর চোখ দুটি স্থির হয়ে যায়। হযরত আবু বাকার (রা.) এই দৃশ্য দেখে তাঁকে উদ্ধার করেন। এই কারণে অত্যাচারীরা হযরত আবু বাকার (রা.)-কে এমন প্রহার করে যে, তিনি (রা.) বাড়ি এসে দেখেন মাথায় হাত দিলে চুল উঠে আসছে।

(ইবনে হুশশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫১)

হযরত খাব্বাব বিন আল আরিস (রা.) কামার ছিলেন। মক্কার অত্যাচারীরা ভাটি থেকে জ্বলন্ত কয়লা বার করে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দিত। বার বার এইভাবে কষ্ট দেওয়ার কারণে তাঁর কোমরের চামড়া পুড়ে কালো ও শক্ত হয়ে গিয়েছিল। হযরত খাব্বাব (রা.) একবার হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, আমাদের জন্য আপনি খোদার কাছে সাহায্য কেন চান না? আঁ হযরত (সা.) শুয়ে ছিলেন। তিনি (সা.) উঠে বসলেন, তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি বললেন-

তোমাদের পূর্বে মানুষের মাথার উপর করাৎ রেখে চিরে দেওয়া হত। লোহার চিরুনীর আঁচড় দিয়ে তাদের দেহ থেকে মাংসখণ্ড তুলে নেওয়া হত। কিন্তু এই যাতনা তাদেরকে ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি (সা.) বলেন-

খোদার কসম! আল্লাহ্ এই ধর্মকে জয়যুক্ত করবেন। নিজের ইচ্ছা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এমন সময় আসবে যখন মুসাফিরগণ একাকি যাত্রা করবে এবং তারা খোদা ছাড়া তাদের অন্য কারোর ভয় থাকবে না।

(বুখারী)

যে সমস্ত অসহায় মুসলমানদের জাগতিক সম্পদ ও শক্তি সামর্থ্য কম ছিল তাদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। হযরত বিলাল বিন রাব্বাহ (রা.) একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ছিলেন। তার প্রভু উমাইয়া বিন খালাফ অত্যাচার করার জন্য কুখ্যাত ছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মক্কার উত্তপ্ত বালুকা রাশির উপর হযরত বিলালকে উলঙ্গ করে শুইয়ে রাখত এবং বুকের উপর একটি প্রকাণ্ড পাথর চাপিয়ে দিত। সে বেলালকে জোর দিয়ে বলত যে, খোদার অস্বীকার করলে তবেই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।কিন্তু বেলাল কেবল একটি শব্দই উচ্চারণ করতেন। 'আহাদ' 'আহাদ'। অর্থাৎ আল্লাহ্ এক।

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 7 May , 2020 Issue No.19

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

রমযানুল মুবারকের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের নিবিড় সম্পর্ক

তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রমযানুল মুবারকের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের নিবিড় সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

“যদি রমযান থেকে উপকৃত হতে হয় তবে তাহরীকে জাদীদের উপর আমল কর আর যদি তাহরীকে জাদীদ থেকে উপকৃত হতে হয় তবে সঠিক অর্থে রোযা থেকে উপকৃত হও। তাহরীক জাদীদ হল সাদামাটা জীবন যাপন করা এবং নিজেকে পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারে অভ্যস্ত করা। রমযানও আমাদেরকে এই একই শিক্ষা দিতে আসে। অতএব যে উদ্দেশ্য নিয়ে রমযান এসেছে তা অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা ও প্রচেষ্টা কর। .... প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত তার রমযান যেন তাহরীক জাদীদময় হয় এবং তাহরীক জাদীদ রমযানময় হয়। রমযান যেন আমাদের জন্য প্রবৃত্তি দমনকারী হয় আর তাহরীক জাদীদ আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবনকারী হয়। তাই আমি যখন বলেছি যে, রমযান থেকে উপকৃত হও তখন এর অর্থ ধরে নেওয়া উচিত যে, তোমরা তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যাবলীকে রমযানের আলোকে উপলব্ধি কর। আর যখন আমি বলেছি যে, তাহরীকে জাদীদের প্রতি দৃষ্টি দাও, তখন এর অর্থ ভিন্ন বাক্যে এই যে, তোমরা সর্বাবস্থায় নিজেদেরকে রমযানের পরিস্থিতির মধ্যে রাখ এবং যথাযথ ও ধারাবাহিক কুরবানীর অভ্যাস তৈরী কর। যে রমযান প্রকৃত কুরবানী ছাড়াই ব্যতীত হয় সেটি রমযান নয়। আর যে তাহরীকে জাদীদ আত্মাকে সঞ্জীবিত না করেই অতিবাহিত হয় সেটি তাহরীকে জাদীদ নয়। ” (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠ নভেম্বর, ১৯৩৮)

হুযুর (রা.) বলেন: রমযানের যে শেষ দশদিন আসতে চলেছে তা তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে বিগত কুরবানী জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তি অর্জনকারী হিসেবে ব্যয় করুন। যারা বিগত বছর গুলিতে কুরবানীর তৌফিক পেয়েছেন তারা এর জন্য খোদা তা’লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং প্রত্যেক দোয়াকারী আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া যেন করে যে, সে ধর্মের মর্যাদা ও দৃঢ়তার জন্য সেলসেলার জন্য যে ত্যাগস্বীকার করেছে, পরিণামে আল্লাহ্ তা’লা তার উপর স্বীয় কৃপা ও অনুকম্পা নাযেল করুন এবং তার জন্য সেই ভালবাসা ও নিষ্ঠা অনুসারে স্বীয় আশিস ও ভালবাসা নাযেল করুন যার কারণে সে খোদা তা’লার পথে কুরবানী করেছিল। আমীন।

(আলফযল, ১৫ নভেম্বর, ১৯৩৮)

জামাতের নিষ্ঠাবানদের রীতি হল তারা রমযান মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদে নিজেদের চাঁদার ওয়াদা একশ শতাংশ পূর্ণ করে আল্লাহ্ তা’লা কৃপা ও আশিস অর্জনের চেষ্টা করে। অতএব জামাতের সদস্যদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন ২০ রমযান অর্থাৎ ১৪ ই মে পর্যন্ত নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) এর বিশেষ দোয়ার অংশ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ্ তা’লা আপনাদের সকলের প্রচেষ্টাকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দিন, জামাতের সকল একনিষ্ঠ সদস্যদের সম্পদে অপার বরকত দিন এবং তাদেরকে নিজের অসীম কৃপা, বরকত ও রহমত দ্বারা ভুষিত করুন।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

সমস্ত জেলা ও স্থানীয় আমীর/জামাতের সদর/সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ/ মুবাল্লিগ ইনচার্জদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে দয়া করে নিজের নিজের জামাতের শতভাগ চাঁদাদাতাদের নামের তালিকা ১৪ই মে তারিখের পূর্বে ডাক ও ২০ শে মে তারিখের পূর্বেই- মেলের মাধ্যমে ওকালতে মাল তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ানে পাঠিয়ে দিন, যাতে সমস্ত তালিকাগুলি সম্মিলিভাবে ২৯ শে রমযানের সমবেত দোয়ার জন্য সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা যায়। জাযাকুমুল্লাহ তা’ল খায়রান।

ওকীলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান।

****

করোনা ভাইরাস থেকে ছড়িয়ে পড়া মহামারি থেকে রক্ষা পেতে হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাপত্র

সারা বিশ্বে corona virus দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রতিষেধক হিসেবে

১) প্রতিষেধক ওষুধগুলি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ রেখে পুনরায় দুই সপ্তাহ সেবন করুন। এভাবে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করুন। ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদেরকে এই ওষুধ সপ্তাহে একবার দিন।

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSEMIUM-200

2) 5-15 বছরের বাচ্চা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

ক) ACONITE-200, ARSENIC ALB -200, GELSINIUM-200

(খ) Chellidonium Maj -1x

এই দুটি ওষুধ ‘ক’ এবং ‘খ’ তিন দিন অন্তর পালাক্রমে (যেমন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার) সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে একবার।

৩) এছাড়া অন্য সকলের জন্য:

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSEMIUM-200

এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুদিন একবার করে । (তিনদিন অন্তর) এবং দশ ফোঁটা ওষুধ সামান্য পরিমাণ জলসহ সপ্তাহে তিন দিন (দুই দিন অন্তর) একবার করে।

মহামারি দ্বারা আক্রান্ত হলে

1) Influenzum-200, Bacillinum-200, Diptherinum-200

এক সপ্তাহ সকাল-সন্ধ্যা, এরপর সপ্তাহে দুইবার (তিনদিন অন্তর)

২) Arnica-30, Baptisea-30, Arsenic Alb-30,Hepar Sulph-30, Nat. Sulph-30

দশ দিনে দুই থেকে তিন বার

৩) Chellidonium Maj -1x সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে দিনে দুইবার।

যুগ খলীফার বাণী

“দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir